অশনি-সংকেত ঃ আঙ্গিক ও শিল্পরূপ

বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় "অশনি-সংকেত" অনেকটাই ক্ষুদ্রায়তনের। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের সময়ে গ্রাম-বাংলার অসংখ্য অনশন-ক্লিষ্ট মানুষের জীবনকথা এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। উপন্যাসের প্রথমাংশে আছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণ এবং তার স্ত্রী-পুত্রদের কাহিনী। এখানে লেখক দেখিয়েছেন গ্রামের ভূমিহীন মানুষরা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কিভাবে বারবার বাসস্থান পরিবর্তন করতে করতে শেষে একটা জায়গায় গিয়ে থিতু হয়। গ্রামবাসী মানুষের কাছে জমি, বিশেষ করে ধানী জমি একটা বড় সম্বল। জমির স্বত্বলাভের ব্যাকুলতা উপন্যাসের প্রারম্ভে এবং শেষেও লেখক গঙ্গাচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শিক্ষকতা, পৌরোহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে গঙ্গাচরণের যখন কিছুটা সচ্ছল অবস্থা, তখনই দেশে দেখা দিল চালের অনটন। সেই অনটন ধীরে ধীরে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের রূপ নিল। যাদের জমির ধান ছিল, তারা চড়া দামে ধান বিক্রি করে দিল। ব্যবসাদাররা অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় ধান চাল লুকিয়ে গুদামজাত করল। ফলে অন্নহারা মানুষে দেশ ভরে গেল। শহর অপেক্ষা গ্রামের মানুষের দুরবস্থা হল অবর্ণনীয়। বিভূতিভূষণ সেই কাহিনীকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করেছেন এবং

প্রতিটি ঘটনাচিত্রের মধ্যে দিয়ে তা শোচনীয় পরিণামের দিকে এগিয়ে গেছে। কোন ঘটনাকেই অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না।

কাহিনীগ্রন্থনের সঙ্গে চরিত্রচিত্রণেও লেখকের মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। বিভূতিভূষণ জীবনশিল্পী। তিনি মানুষকে দেখেন তার ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে। সম্পূর্ণ নির্দোষ ভালো মানুষ এবং আপাদমস্তক মন্দ মানুষ জগতে প্রায় বিরলদৃষ্ট। সেই বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেই বিভূতিভূষণ মানবচরিত্রকে দেখেছেন এবং সাহিত্যে তা রূপায়িত করেছেন। তাই ভড়ংসর্বস্ব স্বার্থপরায়ণ গঙ্গাচরণের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যম। উপস্থিতবুদ্ধি এবং সহযোগী মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহ দেখা যায়। বিরক্ত হলেও মানুষকে রূঢ় কথা সে বলতে পারে না। খাদ্যের তীব্র অনটনের সময়ে দীনু ভট্চায এবং দুর্গা বাঁড়ুয্যের প্রতি ব্যবহারে তার এই চারিত্র্যধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। তার যেমন বাৎসল্য আছে, তেমনি পত্নীপ্রেমও তাকে মাধুর্য দান করেছে। গঙ্গাচরণের সঙ্গে তার স্ত্রী অনঙ্গ-বৌ নারীধর্মের সমস্ত আদর্শ নিয়ে এ উপন্যাসে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। অনঙ্গই এ উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ চরিত্র। তার স্বতোৎসারিত মাতৃস্নেহ শুধু তার সন্তানদেরই নয়, অন্যের সন্তান, এমন-কি বয়স্ক অসহায় মানুষকেও সাদরে আশ্রয় দিয়েছে। অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি তার সেবা, ভক্তিপরায়ণতা, হীন পতিত মানুষের জন্য বুকভরা মমতা তাকে অত্যন্ত কমনীয় ও সহনীয় করেছে। পেটের জ্বালায় মানুষ যখন মনুষ্যত্বকে বিলিয়ে দিতে চাইছে, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পাপের পথে নেমে যাচ্ছে, অনঙ্গ তখন নিজেকে রক্ষা করেছে এবং নিজের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভালবাসা দিয়ে অপরকেও রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। সর্বোপরি উপন্যাসের শেষে তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মত শ্রেণী-চেতনার যে আবরণটা ছিল তাকে সরিয়ে দিতে অনঙ্গ-র উদ্যম মহোত্তম।

উপন্যাসের শুধুমাত্র প্রধান চরিত্রগুলিই নয়, অপ্রধান চরিত্রগুলিকেও বিভূতিভূষণ সমান সহানুভূতি ও দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। দুর্গা বাঁড়ুয্যে এবং দীনু ভট্চাযের উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, মতি-মুচিনীর প্রতিবেশিনীর প্রতি সহৃদয়তা ও মমতা, এমনকি স্বল্প-পরিসরে নিবারণ ঘোষের বিধবা বড় মেয়ে ক্ষ্যান্তমণির পরদুঃখকাতরতাকে বিভূতিভূষণ যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন তা আমাদের চমৎকৃত করে। এমনকি বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে যাই, যখন দেখি কাপালী-বৌ নিজের দেহ বিক্রি করা আধ পালি চাল এনে তার থেকে অনঙ্গকে কিছু নেবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করছে। এই দৃশ্য দেখে স্বৈরিণী মেয়েটির প্রতি আমরা বিদ্বিষ্ট হতে পারি না, বরং আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আসলে মানুষের সমস্ত স্খলন পতন ত্রুটিকে তার স্বভাবধর্মে দেখার মত একটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি বিভূতিভূষণের ছিল। চরিত্রগুলি প্রায়ই 'টাইপ' হয়ে থাকেনি, বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

চরিত্র প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার ভাষা, অর্থাৎ সংলাপ ও উপস্থাপনার গুণে। কোন রোমান্টিক ভাব বা প্রকৃতি বর্ণনায় বিভূতিভূষণ প্রায়ই ধ্বনিমাধুর্যপূর্ণ তৎসম শব্দসমৃদ্ধ কাব্যময় ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁর 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' প্রভৃতি উপন্যাসের বহুস্থানে এবং 'মেঘমল্লার', 'স্বপ্ন-বাসুদেব' প্রভৃতি গল্পে এর পরিচয় মেলে। কিন্তু আলোচ্য 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসের গ্রামীণ জীবনালেখ্য বর্ণনায় তিনি সহজ সরল চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

১) তবে চলিত হলেও এ ভাষা গ্রাম্য নয় এবং প্রসাদগুণ-সম্পন্ন।

২) সংলাপ রচনায় বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত।

এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ-পত্নী বিজয়া রায়ের উক্তি স্মরণীয় ঃ

"(সত্যজিৎ রায়) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি-সংকেত' করছেন। বইটা পড়ে অবধি ওঁর মন ভরে গিয়েছিল। বলছেন, 'এত সুন্দর একটা ছবি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এর মধ্যে।' তা ছাড়া বিভূতিবাবুর বই থেকে ছবি করতে ওঁকে অনেক কম খাটতে হত। কারণ কথা অর্থাৎ ডায়ালগ প্রায় বদলাতেই হত না—দৃশ্যের পর দৃশ্য এমনভাবে লেখা, মনে হয় যেন ছবির জন্যই লেখক লিখেছেন। ছবিটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেতেন।"

— 'আমাদের কথা' বিজয়া রায় (দেশ ১৭ মার্চ, ২০০৪)

৩) নিম্নশ্রেণীর পুরুষ ও নারীদের মুখের ভাষা অনেকটাই আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবযুক্ত। যেমন—

(১) 'অনঙ্গদের বাড়ি গোয়ালাপাড়ার প্রান্তে, দুখানা মেটেঘর। খড়ের ছাউনি, একখানা দোচালা রান্নাঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠানের ধারে পেঁপে ও মানকচু গাছ। চালে দিশি কুমড়োর লতা দেওয়া হয়েছে কঞ্চি দিয়ে, রান্নাঘরের পাশে গোটাকতক বেগুন গাছ, ঢেঁড়শ গাছ।'

(২) 'আগন্তুক ম্যালেরিয়া রোগী, তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়। গঙ্গাচরণ বাড়ির বাইরে আসতেই সে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—একবার হাতখানা দেখুন তো?'

গঙ্গাচরণ ধীরভাবে বললে—'অমন করে হাত দেখে না। বসো, ঠাণ্ডা হও। হেঁটে এসেচ, নাড়ী চঞ্চল হবে যে! বাপু এ কোদাল কোপানো নয়! এসব ডাক্তার-বদ্যির কাজ, বড্ড ঠাণ্ডা মাথায় করতে হয়। কাল কেমন ছিলে?'

বিভূতিভূষণ 'গো', 'রে' প্রকৃতি সম্বোধনসূচক অব্যয় যোগ করে কোথাও কোথাও সংলাপকে খুব আন্তরিক করেছেন যেমন—যদু-পোড়া আদরের সুরে বললে—'তুমি অমন করচো কেন হ্যাঁগো! বলি আমি কি পর?' অথবা 'অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের ও আনন্দের সুরে বললে— কি রে ছোট-বৌ?'

(৩) 'কাপালী-বৌ ভেংচি কেটে বললে—ইদিকি! দেখতে পেইচি। এ অন্ধকারে আর ও ভূতের রূপ চোখ মেলে দেখতি চাইনি। আঁতকে ওঠবো।'

এছাড়া শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনে সাহিত্যে প্রতীক ব্যবহারের রীতি প্রচলিত। বিভূতিভূষণ উপন্যাসের প্রারম্ভে সম্ভাব্য বিপদের ইঙ্গিত দেবার জন্য নদীতে কুমীর আসার কথা বলেছেন। উপন্যাসের অশনি-সংকেত নামটিও বেশ ব্যঞ্জনাবহ।

এ উপন্যাসে ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী অবশ্যই গদ্যময়। তবু কিছু কিছু হৃদয়াবেগ, কিছু স্বপ্ন-কল্পনা অন্ধকারে ক্বচিৎ বিদ্যুদ্দীপ্তির মত রোমান্সের রসাবেশ সৃষ্টি করে আবার মিলিয়ে গেছে। বিশেষ করে উপন্যাসের আদ্যন্ত জুড়ে আছে অনঙ্গ-র পদ্মবিলের ধারে ঘর বাঁধবার কামনা। কিন্তু মতি-মচিলীর মত্যতে যে সমহ বিনষ্টির সচনা হয়েছে, তাতে মনে হয় অনঙ্গ-র কামনা কামনাই থেকে গেছে। এই গ্রাম্যবধূর ঐকান্তিক আশা এবং আশাভঙ্গের বেদনাও এই উপন্যাসের বিয়োগান্ত পরিণতিকে আরও রসনিবিড় করে তুলেছে।

তবু বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসকে শুধুমাত্র বিষাদ এবং হতাশা দিয়েই শেষ করেননি।

তিনি 'কল্লোল' এবং 'কালিকলম'-এর যুগে লেখনী চালনা করলেও পাশ্চাত্ত্যের হতাশার দ্বারা আক্রান্ত হননি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করার পথনির্দেশ তিনি রেখে গেছেন। মাটি-সারের পরিচর্যা করে কৃষির উন্নতি ঘটালে, তবেই ঘটবে মানুষের মুক্তি। গঙ্গাচরণের কাঙ্ক্ষিত জমিতে অনঙ্গ-র সংগৃহীত বীজ বপন করলে ফলবে সোনার ফসল—শুরু হবে নবান্নের উৎসব। কিন্তু একাজে পরিশ্রম করতে হবে সকলকেই। তথাকথিত ভদ্রলোকদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাই পরিশেষে মনে হয়, শুধুমাত্র মন্বন্তর কবলিত গ্রাম-বাংলার ঐতিহাসিক চিত্র রচনাই নয়, ভূমিহীন মানুষের ভূমিলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং কৃষিক্ষেত্রে সর্বশ্রেণীর মানুষকে শ্রমদানের সোচ্চার আহ্বান বিভূতিসাহিত্যে 'অশনি-সংকেত'-কে এক বিশেষ মাত্রা দান করেছে। তার সঙ্গে অস্পৃশ্যতা অপনোদনের কথা তো আছেই।

এইভাবে কাহিনী, চরিত্র, ভাষা ও ভাবের অচ্ছেদ্য গ্রন্থনে এবং আশাবাদী জীবনদর্শনে 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসের আঙ্গিক ও শিল্পরূপ উৎকর্ষ লাভ করেছে।